বাংলাদেশের অভ্যুদয়পর্বে জাতিসংঘের ভূমিকাঃ মুক্তাঞ্চলের তিনটি পত্রিকার দৃষ্টিতে

শরিফ উল্লাহ্ ভূঁইয়া[১]
আশফাক হোসেন[২]

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মতামত বিশেষত বৃহৎ শক্তিগুলোর মেরুকরণ, গণমাধ্যম ও বিশ্বজনমতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘের ভূমিকা নির্ধারিত হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ প্রশ্নেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। দক্ষিণ এশিয়ার এই মানবিক ও রাজনৈতিক সংকটে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত, দ্বন্দ্বমূলক ও সাফল্য ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। বিতর্কিত এ কারণে যে, সে সময় উদার গণতন্ত্রী দেশসমূহের মানুষ এবং সমাজতন্ত্রী বলয়ের জনগণ ও রাষ্ট্রসমূহ মনে করেছিল যে, গণহত্যা বন্ধ এবং শরণার্থীদের ভারত গমনের স্রোত বন্ধে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় ও ব্যর্থ। দ্বন্দ্বমূলক এ কারণে যে, সংস্থাটির কিছু আইনগত কারণে এবং বৃহৎ শক্তি বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির কারণে স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণে দ্বিধান্বিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রসহ মুসলিম বিশ্ব, চীন ও এদের মিত্র দেশের সরকারগুলি (প্রধানত আফ্রিকা) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তখন ভারত আন্তর্জাতিক বিশ্বে দুর্বল অবস্থানে ছিল এবং একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ ব্যতীত ঐ দেশের বন্ধু রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল স্বল্প। উক্ত অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে জাতিসংঘের ভূমিকায় এবং এ সংস্থার ব্যর্থতার বিশ্লেষণে এ সব কার্যকারণ গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়। তবে শরণার্থী সমস্যাজনিত মানবিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের উদ্যোগ ইতিবাচক ছিল।[১] অবরুদ্ধ ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যম বিশেষ পত্র-পত্রিকা জাতিসংঘের ভূমিকা বিষয়ে তেমন কিছু প্রকাশ না করলেও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি জাতিসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই দিকটি এখনো স্বল্প আলোচিত ও অবহেলিত। বর্তমান প্রবন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন সমগ্র বাংলাদেশ পাকিস্তানী সামরিক জান্তার দখলে চলে যায়, তখন রাজধানী ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত অনেক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ইত্তেফাকসহ

---

১. অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কয়েকটি পত্রিকা অফিস পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। প্রবর্তী সময়ে যদিও ইত্তেফাক এবং আরো কয়েকটি পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল তথাপি এগুলোর কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ এবং এতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্দেশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতো। এসব পত্রিকায় পরিবেশিত তথ্য ও সংবাদ ছিল একপেশে, বিভ্রান্তিকর এবং মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ঘটনা প্রবাহ সেখানে স্থান লাভ করেনি। এই ভয়াবহ তথ্য শূন্যতা কিছুটা হলেও দূর করেছিল মুক্তাঙ্গন তথা মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ যুদ্ধের নানা ধরনের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলোতে থাকতো বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতি ও বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃহৎ শক্তি ও জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা, প্রবাসে বাঙালিদের তৎপরতা এবং বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকার সংবাদ। এসব পত্রিকাসমূহের মধ্যে যে তিনটি পত্রিকাকে বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে তার যুক্তিসংঘত কারণ রয়েছে। এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে বাংলায় প্রকাশিত দুটো পত্রিকা জয়বাংলা ও মুক্তিযুদ্ধ সার্কুলেশন বা প্রচারের দিক থেকে শীর্ষস্থানে ছিল। এ দুটো পত্রিকা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। অর্থাৎ বৃহৎশক্তি ও জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে সর্বাধিক সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি পত্রিকার মধ্যে Bangladesh পত্রিকাটি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে নেবার ক্ষেত্রে এর অবদান অসামান্য। বর্তমান প্রবন্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে দেশীয় সংবাদ মাধ্যম বিশেষ করে পত্রপত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে এই তিনটি পত্রিকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সামনে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। বিশেষ করে জাতিসংঘ সনদের কিছু ধারার আইনগত ব্যাখ্যা প্রসংগে পাকিস্তান এবং তার মিত্ররা কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। জাতিসংঘের সনদের প্রথম অধ্যায়ের ধারা ২ এর ৪ উপধারায় বলা হয়েছে,

> আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধণিতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্যহীন কোন উপায় গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

এতদ্ব্যতীত ধারা ২ এর ৭ উপধারায় বর্ণিত রয়েছে, যে–

> বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোন সদস্যকে জাতিসংঘের দ্বারাস্থ হতে হবে না, কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না।[২]

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভংগ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যেই কেবল একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে জাতিসংঘ এবং অন্য কোন রাষ্ট্রের বক্তব্যকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টিকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে দাবি করে। তদুপরি পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশসমূহ যেমন নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশ, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় সরকারিভাবে এ ঘটনাকে বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনা করতো। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সমর্থন পেয়েছে। দেখা যায় যে, বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান সমর্থক ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালোভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছিল এবং সমর্থন যুগিয়েছিল। যাহোক জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্ন যে ন্যায়সংগত স্থান পায়নি তা মুক্তাঞ্চলের পত্রিকাগুলো বিস্তৃতভাবে তুলে ধরে, যদিও ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘের ভূমিকা ইতিবাচক ছিল।

বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের বিভিন্ন তৎপরতা মুক্তাঞ্চলে প্রকাশিত তিনটি সাপ্তাহিক জয়বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ ও Bangladesh এর দৃষ্টিতে কেমন ছিল তার একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। উল্লেখ্য, মুক্তাঞ্চল থেকে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রায় অর্ধশত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তবে সবকটি সংবাদপত্রের সকল সংখ্যা পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র জয়বাংলা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং মুজিবনগর সরকারের বহির্বিশ্ব প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক The Bangladesh এর অধিকাংশ সংখ্যা পাওয়া যায়। এ তিনটি পত্রিকায় জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে যে, ব্যাপকভাবে লেখালেখি হয়েছে তা নয়। তবে বিভিন্ন সময় কিছু তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা, মন্তব্য ও সংবাদভাষ্য মুদ্রিত হয়েছে। মুক্তাঞ্চলের পত্রিকাসমূহের সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে আবেগ ও যুদ্ধ প্রচারণা প্রাধান্য পায়। জাতিসংঘ তার সীমাবদ্ধতা, যেমন আইনগত জটিলতা এবং বৃহৎ শক্তির চাপে বিরোধের অন্যতম পক্ষ বাংলাদেশ সম্পর্কে উদাসীন থাকায় এসব সংবাদপত্র জাতিসংঘের তীব্র সমালোচনা করে। ফলে, ভারত আশ্রিত বাঙালি শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সংস্থাটি যে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছিল জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও ত্রুটি মোচনে ঐ সব পত্রিকার দৃষ্টিতে তা' যথেষ্ট মনে হয়নি। এখানে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হবে।

জয়বাংলা

১৯৭১-এ জয়বাংলা ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন আহমদ রফিক এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের নাম মতিন আহমদ চৌধুরী। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো মুজিবনগরের জয়বাংলা প্রেস থেকে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আহমদ রফিক কর্তৃক এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আহমদ রফিক হচ্ছে সম্পাদক ও প্রকাশের ছদ্ম নাম। আসলে মূল ব্যক্তিটি হলেন আওয়াম লীগ নেতা আবদুল মান্নান।

জয়বাংলা প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং সংবাদসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে জাতিসংঘের ভূমিকার বিষয়টি এতে আলোচিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে এটি ছিল সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। এই পত্রিকায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এ দলের নেতাদের নিয়ে গঠিত সরকারের অভিমত প্রতিফলিত হত। তবে এছাড়াও অনেক বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ এবং সংবাদ ভাষ্য প্রত্যেক সংখ্যায় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন– ১৯ মে ১৯৭১ তারিখে জয়বাংলা এর অন্যতম প্রধান শিরোনাম ছিল, "মানবতার ক্রন্দনরোলে কাঁপছে আল্লাহর আরশ কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে কবে?" এ সংবাদ ভাষ্যে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে বৃহৎ শক্তি ও জাতিসংঘের নীরবতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয় এবং বলা হয় যে, পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। এই সংবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল ঃ

> উথান্ট সাহেব কি জাতিসংঘের (জাতিসঙ্ঘে) মানবাধিকার সনদের কথা ভুলিয়া গিয়েছেন? না শুধু বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত না থাকলে তাঁর কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণী বেরোতে বাঁধে? শুধু বিনয়ের সাথে উথান্ট সাহেবকে জানাতে চাই বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) যে মানব নিধনযজ্ঞ চলছে তা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার নয়। এ যুদ্ধ একটি জাতির সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন, সিদ্ধান্ত নিন। যাতে জাতিসংঘের (জাতিসঙ্ঘের) প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে না ফেলে।[৩]

জাতিসঙ্ঘের প্রতি বাংলার মানুষের এই যে আস্থা হারিয়ে ফেলার কথা জয়বাংলা বলেছিল তার কিছু কারণ ছিল। ১৯ মে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনুমান করা যায় যে, জাতিসংঘ বিভিন্ন কৌশলে পাকিস্তান সরকারকে সহায়তার চেষ্টা করে। ১৯ জুলাই জাতিসংঘ মহাসচিব ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন যে, সীমান্তের দুই প্রান্তে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হোক।

মহাসচিব সীমিত আকারে এ ধরনের ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে দুইটি বা তিনটি স্থান নির্বাচন করে কাজ শুরু করার কথা

বলেন। কিন্তু ভারত সরকার কৌশলের সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে যে, ভারত শরণার্থীদেরকে পাকিস্তানী সৈন্যদের অধিকৃত পূর্ব বাংলায় ফেরত যেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে বাঙালিরা স্বদেশে ফেরত যেতে পারছে না।[৫] ভারত সরকারের এই বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। মুজিবনগর সরকারও জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি 'ঘৃণাভরে' প্রত্যাখ্যান করে। জয়বাংলা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি সমালোচনা করে। ৩০ জুলাই এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। "জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত" শিরোনামে সরাসরি কিছু মন্তব্য করা হয়। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল ঃ

> জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) এই নয়া চক্রান্তের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। দখলীকৃত বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) ইয়াহিয়ার হানাদারবাহিনী এখন ক্রমবর্ধিত গেরিলা তৎপরতায় কাবু হয়ে পড়েছে। জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ইয়াহিয়ার হানাদার চক্রের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে তাদের নেপথ্যের মুরুব্বীরা চাচ্ছে হানাদারদের এই চরম মার থেকে বাঁচতে। পর্যবেক্ষক মোতায়েনের নামে যদি বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) ও ভারত সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) বাহিনী মোতায়েন করা যায়, তাহলে মুক্তিবাহিনী ও গেলিাদের তৎপরতা রোধ করা যাবে এবং তাদের মার থেকে হানাদার বাহিনীকে বাঁচানোও যাবে, এই তাদের দুরাশা।[৬]

অবশ্য এই দুরাশা পূরণ হয়নি। কারণ বাংলাদেশ ও ভারতের সক্রিয় বিরোধিতার কারণে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR)-এর পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি। প্রস্তাবটি আইনগত দিক থেকেও বৈধ ছিল না। কারণ শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকী করার জন্যে সীমান্তের দুই প্রান্তে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের ক্ষমতা জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR)-এর এখতিয়ারভুক্ত নয়। সনদের চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী নিরাপত্তা কেবল এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে।[৭] ১৭ সেপ্টেম্বর জয়বাংলা রাজনৈতিক ভাষ্যে জানায় যে, "বিশ্ব মানবতা জল্লাদ ইয়াহিয়ার বিচার চায় জাতিসংঘ তা করতে পারে"[৮]। ইয়াহিয়ার বিচার প্রশ্নে জয়বাংলা যেভাবে জাতিসংঘকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তা আন্তর্জাতিক আইনে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, জাতিসংঘ সনদের ২(৭) ধারা অনুযায়ী তা করতে পারতো না। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের জন্যে বিচারের বিষয়টি একেবারে দৃষ্টান্তহীন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ ও টোকিও-তে বিশেষ আদালতে যুদ্ধাপরাধের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু দখলীকৃত বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও জাতিসংঘ তা উপেক্ষা করে, প্রধানত দুটো কারণে। প্রথমত, তখনও যুদ্ধ চলছিল অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর যখন জয়বাংলা ইয়াহিয়ার বিচারের কথা বলেছিল। দ্বিতীয়ত,

যুদ্ধপরাধের প্রমাণ থাকলেই যে বিচার হবে এমন নয়, এর জন্যে বৃহৎ শক্তির সদিচ্ছা ও চাপ খুবই প্রয়োজন। ১৯৭১ এর ইয়াহিয়ার শক্তির উৎস ছিল চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে জাতিসংঘ ইয়াহিয়ার বিচার করতে ব্যর্থ হলেও ইয়াহিয়া যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন জাতিসংঘ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে ইয়াহিয়ার দুঃসাহস ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়েছিল। এ প্রসংগে প্রবন্ধের শেষাংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবছর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে এবং পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন বসে।

১৯৭১ সালে সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনকে সামনে রেখে মুজিবনগর সরকার একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদল সম্পর্কে প্রথম সংবাদটি জয়বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। এতে বলা হয় যে, বিশ্বের গণতন্ত্র ও স্বাধীণতাকামী মানুষের সমর্থনকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা নিবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল। ঐ সংবাদে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ।[৯] কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহে (২৪ সেপ্টেম্বর) জয়বাংলা প্রতনিধি দলের একটি বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরে। এতে দেখা যায় যে, প্রতিনিধি দলে খন্দকার মোশতাকের নাম নেই। তার পরিবর্তে দেখা যায় জাতিসংঘসহ বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নাম।[১০] মোশতাকের বিরুদ্ধে ঐ সময় কলকাতাস্থ মার্কিন কনসুলেটের সাথে গোপন যোগাযোগের অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ভারত সরকার যখন যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত হন তখন মোশতাককে বাদ দেয়া হয়।[১১] অবশ্য জনগণের মধ্যে যাতে কোন ধরনের বিভ্রান্তি দেখা না দেয় সেজন্যে জয়বাংলা কোন প্রেক্ষাপটে মোশতাক বাদ পড়েছেন তার কোন ব্যাখ্যা দেয়নি।

৪ অক্টোবরের জয়বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ প্রশ্নে যে বিতর্ক ছিল অর্থাৎ রাজনৈতিক বা সামরিক কোন উপায়ে এর সমাধান হবে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া হয়। ঐ সংবাদ ভাষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান পরিস্কার করে তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়েছিল,

> সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘে (জাতিসংঘে) সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা ও ফ্রান্স কর্তৃক বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী করা, ভারত-সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্ত ইশতেহারে রাজনৈতিক সমাধান' কথাটি ব্যবহৃত হওয়া প্রভৃতি ঘটনায় কোন কোন মহল বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার ও আওয়ামী লীগ মহলে নৈরাশ্য দেখা দেওয়ার এবং ইয়াহিয়ার শর্তে রাজনৈতিক আপোষ আলোচনার সম্ভাবনার উড়ো খবর প্রচার করেছেন। বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগ মহলের সংগে যোগাযোগ করে

জয়বাংলা প্রতিনিধি জানতে পেরেছেন যে, এই ধরনের নৈরাশ্য সৃষ্টি ও আপোষ আলোচনার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উড়ো খবর। আওয়ামী লীগ মহল দৃঢ়তার সঙেগ (সঙ্গে) বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ নিশ্চিতভাবেই আপোষ কিংবা স্বাধীনতা ঘোষণা প্রত্যাহার করা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দুই-ই উপায়ে অর্জিত হতে পারে আলোচনা বৈঠক বা রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে, অথবা রণক্ষেত্রে যুদ্ধজয় বা সামরিক মীমাংসার মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালে বৃটেন রাজনৈতিক সমাধান মেনে নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিনিধিরা প্যারিসে অপর পক্ষের সঙেগ (সঙ্গে) আলোচনা বৈঠকে বসেছেন সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আশায়। তারা নিজেদের ন্যায্য দাবী ছেড়ে দেননি।

বাংলাদেশেও বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। এই মুক্তিযুদ্ধ সার্বিক স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তবে ইয়াহিয়া চক্র যদি বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে স্বীকৃত হয়, তাহলে কিভাবে এই আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে বেশ কিছুকাল আগে রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম তার চারদফা শর্ত ঘোষণা করেছিলেন। এই চারদফা হচ্ছে, (ক) অবিলম্বে বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি প্রদান (খ) সকল হানাদার সৈন্য বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার (গ) যেসব বাঙালি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ (ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সরকারের বৈধ অস্তিত্ব মেনে নেয়া। এখানে এই চারটি শর্ত মেনে নেয়া হলে বিনা রক্তপাতে সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক পদ্ধতি অবশ্যই গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সরকার এবং আওয়ামী লীগ মহল আগ্রহী হতে পারেন। সুতরাং রাজনৈতিক সমাধান বলতে তারা আপোষ বা ঘোষিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাওয়অ বুঝায় না।[১২]

২১ অক্টোবর জয়বাংলা জানায় যে, রাষ্ট্রসংঘে পাক অপপ্রচার ব্যর্থ হয়েছে"।[১৩]

মুক্তিযুদ্ধ

এ পত্রিকার সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি। প্রিন্টার্স লাইনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও মুক্তিযুদ্ধ প্রেস হতে মুদ্রিত।[১৪] মুক্তিযুদ্ধ-এ জাতিসংঘ বিষয়ে কিছু সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১ আগস্ট পত্রিকাটির মূল সংবাদটি জাতিসংঘ বিষয়ক ছিল। "ইয়াহিয়া চক্রকে মদদ দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন বিশেষজ্ঞ" শিরোনামে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে জাতিসংঘকে ব্যবহারের মার্কিন কৌশলের নিন্দা করা হয়। একই সমান্তরালে জাতিসংঘকে সতর্ক করে বলা হয় যে, "জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের জানিয়ে রাখা দরকার যে, সরকারের বিনা অনুমতিতে মুক্ত এলাকার মধ্যে পর্যবেক্ষক নিয়োগের অধিকার তাদের নেই এবং ইহা দ্বারা জটিলতা বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোনই সম্ভাবনাই নাই"।[১৫] পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রশ্নে এই পত্রিকাটির সাথে জয়বাংলার বিশ্লেষণের তেমন কোন তফাৎ নেই। সুতরাং এখানে বিষয়টির পুনরুল্লেখের

যৌক্তিকতা নেই। তবে বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের ভেতর ও বাইরে যে রাজনীতি হচ্ছিল পত্রিকাটি সূক্ষ্মভাবে সে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিল। যেমন– ১৯৭১-এর জাতিসংঘ বাংলাদেশ প্রশ্নকে প্রধানত পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে মুক্তিযুদ্ধ ১ আগস্ট সংবাদ শিরোণামে বলা হয় যে, "জাতিসংঘ জানিয়া শুনিয়া 'বোকা' সাজিতেছে এবং বাঙলাদেশের (বাংলাদেশ) মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ইয়াহিয়া বাহিনীর গণহত্যা ও নৃশংস অত্যাচার পাশ কাটাইয়া গিয়া এই প্রশ্নকে পাক-ভারত বিরোধ হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পাইতেছে"।[১৬]

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ মস্কোর ভূমিকাকে প্রশংসার চোখে দেখেছে। কারণ মস্কোপন্থীরা এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক, উদ্যোক্তা এবং পাঠক ছিল। পত্রিকাটির ১০ অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "জাতিসংঘে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইয়াহিয়া-চক্রের প্রতি ধিক্কার জানাইয়া বাঙলাদেশের (বাংলাদেশের) পক্ষে বিশ্বজনমতকে সংগঠিত করিতেছে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মস্কোতে সাংবাদিকদের নিকট খোলাখুলিভাবে যাহা বলিয়াছিলেন 'আমাদের সহানুভূতি পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের প্রতি উৎপীড়িকদের প্রতি নয়' জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব কার্যক্রম দেখা যাইতেছে"।[১৭]

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ভূমিকাকে যথাসম্ভব আদর্শের আবরণ দেয়ার একটি প্রচেষ্টা এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত 'নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি লেনিন ও রুশ বিপ্লবের মহান শিক্ষা' এ কথা দেশে দেশে কমিউনিস্টরা প্রচার করতেন। কিন্তু মস্কো ১৯৭১-এর প্রথম দিকে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে।[১৮] আগস্ট মাসের প্রথম দিকে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পর মস্কোর ভূমিকায় লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন আসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। তবে একটা দ্বিধার ভাব ছিল এবং সমস্যাটি রাজনৈতিকভাবে সমাধানের একটি ইচ্ছাও ছিল। ৪ অক্টোবর জয়বাংলায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে মস্কো একটা পর্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছিল। বিশেষ করে পত্রিকাটি মস্কোর ভূমিকা নিয়ে যে প্রশংসনীয় মন্তব্য করে ডিসেম্বর মাসের চূড়ান্তক্ষণে তা সম্পূর্ণ সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশসমূহের বহুজাতিক প্রচেষ্টায় যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তা সোভিয়েত ভেটোর কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৯]

Bangladesh

ইংরেজি সাপ্তাহিক Bangladesh এর সম্পাদকের নাম নেই। এর প্রিন্টার্স লাইনে বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ মিশন" বহির্বিশ্ব প্রচার দফতর কর্তৃক মুজিবনগর বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৯ সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা-১৭।[২০]

ইংরেজি সাপ্তাহিকী Bangladesh-এ জাতিসংঘ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সাপ্তাহিকীটি পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক নৃশংস গণহত্যার বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্থাপন করে। পত্রিকাটির ১৪ জুলাই সংখ্যা "Pakistan Guilty of Genocide" শিরোনামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ন্যায়সঙ্গত প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। এই গণহত্যা যে জাতিসংঘের সনদের অবমাননা এবং আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন তা ঐ রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়।[২১]

২৮ জুলাই পত্রিকাটি "Double-Dealing by U.N. Official" এই শিরোনামে মন্তব্য করে, "The U.N. has already complied a disgraceful record on Bangladesh by remaining deafeningly silent about the Pakistan Army's open genocide there in clear violation of the U.N. Charter"[২২] অর্থাৎ অধিকৃত বাংলাদেশে পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকায় বাংলা পত্রিকাগুলোর মত Bangladesh- অসন্তুষ্টই ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্বে আধুনিক বিশ্বের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা ঘটেছিল। এই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ১৭ নভেম্বর Bangladesh লিখে,

> This is perhaps the only movement in the world which has seen mass defection of diplomats switching their allegiance from an established Government to a Government engaged in a liberation war. 30 diplomats ranging from Ambassadors down to juniors in the diplomatic service have joined the new Government and 96 other ministerial staff have also switched their allegiance.[২৩]

৮ ডিসেম্বর "Bangladesh No to U.N. Observers Idea" শিরোনামে বলা হয়,"The idea of positing U.N. Observers on the Bangladesh side of the Indo-Bangladesh border was condemned and looked down upon with the contempt by the Government of Bangladesh. The same idea was rejected outright by the Government as early as 22nd July, 1971"[২৪]

জাতিসংঘ শুধু পাকিস্তান সরকারকে সহায়তা করেছে জয়বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশসহ মুক্তাঞ্চলের সবগুলি পত্রিকার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেখা যায় যে, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে সেই নাজুক মুহূর্তে জাতিসংঘ বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। জুলাই এর শেষ সপ্তাহে সামরিক জান্তা ঘোষণা করে যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার

অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করা হবে। এ সংবাদ প্রকাশের পর পরই মুজিবনগর সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ মুজিব হচ্ছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রতীক পুরুষ। তাই উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জীবন রক্ষার জন্যে বিশ্ববাসী ও বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে আবেদন জানান।[২৫] ৯ আগস্ট পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নয়াদিল্লীর সাথে ওয়াশিংটনের সময়ের ব্যবধান সাড়ে দশ ঘণ্টার মতো। ফলে নয়াদিল্লীতে মৈত্রী চুক্তি সংক্রান্ত ঘোষণার পর ঐদিন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেয়।[২৬] জাতিসংঘ মহাসচিব ১০ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে সামরিক জান্তার উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেন। এ প্রসংগে মহাসচিব সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "The secretary General feels that it is an extermely sensitive and delicate matter. The Secretary General shares the feelings of many representatives that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman will inveritabley have repercussions outside the borders of Pakistan."[২৭]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনমূলক বিচার প্রশ্নে মহাসচিবের উদ্যোগের বিষয়টি জানতে পেরে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে মওদুদ আহমদ ১৮ আগস্ট সহকারী মহাসচিবের অফিস (বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়)-এর ডিরেক্টর মিঃ ব্রায়ান, ই, উরকুহার্ট (Brian E. Urquhart) বরাবরে একটি জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ঐ বার্তায় তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আইনজীবী হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[২৮] ব্রায়ান প্রত্যুত্তরে ২৭ আগস্ট জানান যে, জাতিসংঘ মহাসচিব তার এখতিয়ারের মধ্যে মুজিবের নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছেন এবং পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় সে চেষ্টা করেছেন। কারণ শেখ মুজিবের বিচারের বিষয়টি তার (মহাসচিবের) কাছে দারুণ উদ্বেগের বিষয়। ব্রায়ান আরো জানান যে, আইনগত জটিলতার কারণে মওদুদকে মুজিবের আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করতে মহাসচিব তার 'Good Office' ব্যবহার করতে পারছেন না।[২৯]

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার পুনরায় শুরু হলে দেখা যায় যে, এ কে ব্রোহী এবং তাঁর তিনজন সহযোগীকে মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। একই সময় মওদুদ আহমেদ ব্রায়ানের বরাবর একটি পত্রে লিখেন যে, এ কে ব্রোহী হচ্চেন পাকিস্তান সরকার নিযুক্ত আইনজীবী, তিনি বঙ্গবন্ধু মুজিবের ইচ্ছা অনুযায়ী নিযুক্ত হননি। মওদুদ লিখেন যে, সনদ অনুযায়ী মহাসচিবের পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপে সীমাবদ্ধতা আছে সত্যি, কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় অর্থাৎ মহাসচিব যদি তার 'Good Office' ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু

মুজিবের সাথে যোগাযোগ করেন, তাহলে মুজিব নিশ্চিতভাবেই মওদুদকে তাঁর আইনজীবী হিসেবে পেতে চাইবেন।[৩০]

জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ এবং প্রচেষ্টা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই দেখা যায়, "This time Mujib cann't go unpunished" ইয়াহিয়ার এ ধরনের মনোভাবেও হঠাৎ করেই পরিবর্তন আসে। অক্টোবরের শেষে ইয়াহিয়া Newsweek পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে জানান যে, যদি জাতি তার মুক্তি চায়, তবে তিনি তা পূরণ করবেন। পরবর্তীকালে কিসিঞ্জারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের মনোনীত কোন প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে রাজি ছিলেন।[৩১] সুতরাং দেখা যায় যে, জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ, যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এবং মুজিবনগর সরকারের সক্রিয় তৎপরতার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা পায়। একই সংগে জাতিসংঘ ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়।

এ তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রকৃতি মোটামুটি এক। অর্থাৎ জাতিসংঘের ব্যর্থতার সমালোচনা এবং জাতিসংঘের বিতর্কিত পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়। বিশেষ করে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধিদের সীমান্তের দুই অংশে পর্যবেক্ষক হিসেবে মোতায়েনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুক্তাঞ্চলের পত্রিকাগুলি কঠোর ভাষায় নিন্দা করে। একাধিক সম্পাদকীয় এবং সংবাদভাষ্য প্রকাশিত হয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। যদি তখন পর্যবেক্ষক মোতায়েন সম্ভব হতো তাহলে পাকিস্তানের জন্যে সুবিধা হতো এবং মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতো। তাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করা এই পত্রিকাগুলোর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া একটি যুদ্ধমান সরকারের মুখপত্র বা পত্র-পত্রিকার জন্যে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়। জয়বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ ও Bangladesh এর ক্ষেত্রেও অন্যাথা হয় নি। সর্বোপরি যুদ্ধরত একটি জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্যে প্রচারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ তিনটি পত্রিকার সামনে এই বিবেচনা ছিল। তাই জাতিসংঘের কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটিকে তীব্র আবেগ ও ঝাঁঝালো ভাষায় সমালোচনা করা হয়, যাতে বাংলাদেশের বিপক্ষে যায় এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিরা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। শুধু বাংলাদেশের পত্রিকাসমূহই নয় New York Times এর মতো বিখ্যাত পত্রিকা জাতিসংঘের ভূমিকার সমালোচনা করে। যেমন ২৩ নভেম্বর New York Times এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয় যে, উপমহাদেশের শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে জাতিসংঘ যদি কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে শেখ মুজিবসহ নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে ইয়াহিয়ার উপর ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ বিশ্বসংস্থার সমর্থন করা উচিত।[৩২]

পরিশিষ্ট-১

জয়বাংলা-৩০-৭-১৯৭১

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত

বাঙলাদেশে (বাংলাদেশ) এবং ভারতের সীমান্তে জাতিসঙঘ পর্যবেক্ষক দল মোতায়েন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। (জাতিসংঘের) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) জাতিসঙেঘর চল্লিশজন পরিদর্শক পাঠাবার প্রস্তাবও করেছেন। উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, ভারতে চলে গিয়েছেন এমন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যাতে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং তারা পুনর্বাসিত হন তার তদারকি করা। দৃশ্যত প্রস্তাবটি খুবই নির্দোষ ও সাধু। কিন্তু একটি তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে দৃশ্যত সাধু ও নির্দোষ প্রস্তাবটির আড়ালে রয়েছে জাতিসংঘ ও তার প্রধান মুরুব্বি যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এডমিনিস্ট্রেশন নতুন চক্রান্ত। কেবল একটি প্রস্তাব এসেছে তাদের পাকিস্তান ঘেঁষা এজেন্ট প্রিন্স সদরুদ্দিনের মারফৎ। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সরকার এবং ভারত সরকারও সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের 'সাধু প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিছুদিন আগে, জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) তরফ থেকে বাঙলাদেশের (বাংলাদেশের) উদ্বাস্তদের পরিদর্শনের নামে ভারত, পাকিস্তান ও অধিকৃত বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সফরে এসেও সদরুদ্দিন নানা উল্টা-পাল্টা কথা বলে গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ তার দোস্ত ইয়াহিয়ার গণহত্যার পাপ যথাসম্ভব কমিয়ে দেখানো।

প্রিন্স সদরুদ্দিনের কথা থাক। বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) ও ভারতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার প্রস্তাব শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও আমাদের একটি পুরনো গল্প মনে পড়ছে। একবার এক সার্জন একজন রোগী দেখে বললেন, এমন কিছু বড় অপারেশন নয়। এখনি তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করে দেবেন। ঘটা করে সার্জন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। প্রায় ঘন্টা খানেক পরে কক্ষের বাইরে এসে রোগীর রুদ্ধশ্বাস আত্মীয়দের বললেন, 'আপনাদের কি বলবো, অপারেশন অত্যন্ত সাকসেসফুল হয়েছে। তবে দুঃখের কথা এইটুকু যে, রোগী মারা গেছেন।'

বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) ইয়াহিয়ার দস্যুচক্র বেপরোয়া গণহত্যা চালাচ্ছে আজ চার মাস হয়ে গেল। দখলীকৃত বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখনো বাঙলার জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংসের কোন সঠিক হিসাব হয়নি। বেসরকারী হিসেবে আশংকা করা হয়েছে, মৃতের সংখ্যা দশ লাখ, গুরুতরভাবে

আহতের সংখ্যা পঁচিশ হাজার, সাধারণভাবে আহত তিন লাখ, নির্যাতিত নারীর সংখ্যা পনর হাজার থেকে বিশ হাজার। আর বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান নির্বিশেষে শরণার্থী ভারতে ঠেলে দেয়া হয়েছে ৭০ লাখের উপরে। এই পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড যখন চলছিল, তখন বাঙলাদেশের (বাংলাদেশের) নেতারা বার বার জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) ও বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের কাছে মানবতা ও বিশ্বশান্তির নামে আকুল আবেদন জানিয়েছেন, এই শিশুঘাতী বর্বরতা বন্ধে সক্রিয় হোন, বাঙলাদেশে মানবতার স্বার্থে জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) হস্ত ক্ষেপ চাই। জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) কোটি কোটি মানুষের এই বিপন্ন আর্তনাদে কান দেননি। আর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আমেরিকা জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র পাঠিয়েছে। এই অস্ত্র নিরীহ ও নিরস্ত্র নর-নারী হত্যার কাজে লাগানো হবে। এই ধ্বংসযজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, তখন জাতিসংঘ (জাতিসঙ্ঘ) কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চান কি প্রয়োজনে? সেখানে স্তুপাকৃত মৃতদেহের সংখ্যা গুনতে? ধ্বংসস্তুপে পরিণত দখলীকৃত বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) তথাকথিত ত্রাণকার্যের মহড়া দিতে? হ্যাঁ, তাতে জাতিসংঘের ত্রান কার্যের অপারেশন অবশ্যই সাকসেসফুল হবে, কিন্তু রোগী বাঁচবে না, অর্থাৎ বাঙলাদেশের ধ্বংস ও চূড়ান্ত বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। এই ধ্বংস্তুপে মৃতদেহের স্তুপের উপর দাঁড়িয়েই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকেরা তখন হয়ত দাবী করবেন, বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) ধ্বংস হয়ে গেছে, তাতে আমাদের কি? আমাদের অপারেশন (অভিযান) সাকসেসফুল।

(জাতিসঙ্ঘ) জাতিসংঘ নামক একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের যদি যথার্থই কোন অস্তিত্ব থাকতো, তাহলে তারা ভারতের তো দূরের কথা, বাঙলাদেশেও (বাংলাদেশে) পর্যবেক্ষক পাঠাবার নাম এখন মুখে আনতেন না। জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘের) কর্তাব্যক্তিদের স্মরণ আছে কিনা আমরা জানি না, এপ্রিল-মে মাসের দিকে দখলীকৃত বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) ইয়াহিয়ার গণহত্যা যজ্ঞ যখন পুরোদমে চলেছে, তখন জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) সেখানে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ এবং নিজেদের তদারকিতে তা বন্টনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। তারপর জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) পক্ষ থেকে আবার নরম ভাষায় প্রস্তাব দেয়া হল, জাতিসংঘের ত্রাণ সামগ্রী ইয়াহিয়ার সরকারী সংস্থাগুলোই বন্টন করবে, তবে তদারকি করবে জাতিসংঘের লোকেরা। এই প্রস্তাবও প্রথমে ইয়াহিয়ার মনোঃপুত হয়নি। ইয়াহিয়ার কাছে জাতিসংঘ আমল পায়নি। এমন কি তার পৈশাচিক গণহত্যা ও গণ উৎপাদন বন্ধ করতেও (জাতিসংঘ) পারেননি। আক্রমণকারীও অত্যাচারীর বর্বরতা বন্ধ করতে সাহসের সংগে না এগিয়ে দীর্ঘ চারমাস পর এখন সক্রিয় হয়েছেন, পর্যবেক্ষক নিয়োগের নামে আক্রান্ত পক্ষের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ও উদ্যোগ আয়োজন নষ্ট করার জন্য। এ না হলে আর (জাতিসংঘ)। আসলে জাতিসংঘ নামক বিশ্ব সংস্থাটির বহুদিন আগেই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। নিউ ইয়র্কে (জাতিসঙঘ)

জাতিসংঘ সদর দপ্তর নামে যে ভবনটি আছে, তা প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহৎ শবাধার। আর এই শবাধারটি বহনের জন্য সর্বাগ্রে এগিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এডমিনিস্ট্রিশন এবং সর্ব শেষ ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছেন পাকিস্তান নামক একটি অধুনালুপ্ত রাষ্ট্রের বেআইনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

সব চাইতে মজার ব্যাপার এই যে, জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) ভারত সীমান্তেও পর্যবেক্ষক মোতায়েন করতে চেয়েছেন। এ যেন মামার বাড়ির আব্দার। ভারত সরকার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে না বলে দিয়েছেন। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে কি হবে? গৃহস্থ বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। ডাকাত না বেধে, গৃহস্থ বাধার এমন চমৎকার প্রস্তাব আর কখনো শোনা যায় নি। অপরাধ করেছে পাকিস্তান। সত্তর লাখ শরণার্থী সে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়েছে। ভারত এই শরণার্থীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে বিরাট মানবতাবাদী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষণে অপরাধী পাকিস্তানের সংগে মানবতাবাদী ভারতকে একাসনে বসিয়ে ভারতের ঘাড়ে ও পর্যবেক্ষক বসিয়ে দেয়ার প্রস্তাব বাতুলতা না নতুন চক্রান্ত পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতেই তা বিচার্য। এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার, শরণার্থীরা ভারতে গিয়ে বিপন্ন হয়নি, তারা বিপন্ন হয়েছে পাকিস্তান ঘেঁষা জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন ইয়াহিয়ার অনেক দুষ্কর্ম চাপা দিতে চাইলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'পাকিস্তানে ফিরে গেলে শরণার্থীদের জীবন বিপন্ন হবে না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।' যে স্বীকারোক্তির একমাত্র অর্থ, পাকিস্তানে এখনো অত্যাচার চলছে এবং দেশত্যাগীদের প্রত্যাবর্তন সেখানে নিরাপদ ও নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সরকারকে তাদের বৈধ কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে সাহায্য করা। তা না করে শরণার্থীদের জন্য মেকি দরদ দেখিয়ে বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) এবং ভারতে পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রস্তাব আনলে নতুন মোড়কে একটি পুরনো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মাত্র। জাসিঙঘ (জাতিসংঘ) এই চক্রান্তেরই বহু ব্যবহৃত মাধ্যমে।

জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) পর্যবেক্ষক ও জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) বাহিনীর মোতায়েনের 'চমৎকার ফল' বিশ্ববাসী একবার মধ্যপ্রাচ্যে এবং আরেকবার কঙ্গোতে প্রত্যক্ষ করেছে। জাতিসজ্ঘের (জাতিসংঘের) চমৎকার পর্যবেক্ষণ ও খবরদারি প্যালেস্টাইনেও দেখেছে। কঙ্গোতে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত প্রথম জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লুলুম্বা দেশের আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা-পুন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ দেশে নিয়েছিলেন। এই জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) বাহিনীর নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে কঙ্গোর ফ্যাসিস্টচক্র মহান দেশনায়ক লুলুম্বাকে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) এই হত্যাকান্ডের নীরব দর্শক ছিলেন মাত্র। সুতরাং বাঙলাদেশের শরণার্থীদের সেবার অছিলায় সুঁচ হয়ে ঢুকে জাতিসজ্ঘ (জাতিসংঘ) কাদের জন্য ফাল হতে চান, তা বুঝতে 'বোকা বাঙালীরও' খুব বেশী দেরী হয়নি।

জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) মাধ্যমে এই নয়া চক্রান্তের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। দখলীকৃত বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী এখন ক্রমবর্ধিত গেরিলা তৎপরতায় কাবু হয়ে পড়েছে। মুক্ত অঞ্চলে মুক্তি বাহিনীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ইয়াহিয়ার হানাদার চক্রান্তের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে তারা নেপথ্যের মুরুব্বিরা চাচ্ছে, হানাদারদের এই চরম মার থেকে বাঁচাতে। পর্যবেক্ষক মোতায়েনের নামে যদি বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) ও ভারত সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) বাহিনী মোতায়েন করা যায়, তাহলে মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের তৎপরতা রোধ করা যাবে এবং তাদের মার থেকে হানাদার বাহিনীকে বাঁচানোও যাবে, এই তাদের দুরাশা। পাকিস্তানকে এখনো অস্ত্র প্রদানের যুক্তি হিসাবে নিক্সন সরকার যে অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তাহলে, বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য অস্ত্র প্রেরণ দরকার। ভবিষ্যতে এই তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দমনের নামে মুক্তিবাহিনীকে দমনেরও এক চমৎকার যুক্তি নিক্সন সাহেবরা খাড়া করতে পারেন। বাঙলাদেশে যখন জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তখন সেখানে যারা 'উগ্রপন্থীদের' অস্তিত্ব বা তাদের প্রভাব আবিষ্কার করতে পারেন, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ব্যবসায়ীদের এখন প্রধান ব্যবস্থা অস্ত্র বিক্রয়। ভিয়েৎনামের কিছু উদ্বৃত্ত মার্কিন সৈন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীতে ঢুকিয়ে যদি বাঙলাদেশে পাঠানো যায়, তাহলে এখানেও আরেকটি ভিয়েৎনাম সৃষ্টিতে দেরী হবে না এবং মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের অস্ত্র ব্যবসায়েও ভাঁটা পড়বে না। যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি কামী ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরও তাই উচিত, তাদের দেশের রক্ত ব্যবসায়ীদের এই নতুন চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ হওয়া।

বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সমস্যায় জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) যদি কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তার পথ এখনো উন্মুক্ত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের (বাংলাদেশের) উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার সাম্প্রতিক এক ভাষণে এই পথের কথাই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। এই পথ হল, বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) থেকে পাক হানাদার বাহিনী অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ)কে স্বীকার ও জাতিসঙ্ঘে (জাতিসংঘে) স্থান দেয়া গত তেইশ বছর ধরে বাঙলাদেশে যে শোষণ চালানো হয়েছে বিশেষ করে গত ২৫শে মার্চের পর যে ধ্বংস সাধন করা হয়েছে, ইসলামাবাদ সরকারের কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনে সাহায্য করা। একমাত্র এ পথেই বাঙলাদেশ (বাংলাদেশ) সমস্যার শান্তি পূর্ণ ও ন্যায়সংগত সমাধান সম্ভব। জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) তাই উচিত কোন নেপথ্য চক্রীদলের চক্রান্তের মাধ্যম না হওয়া এবং ভাওতাবাজির আশ্রয় না নেয়া। বাঙলাদেশের (বাংলাদেশের) মানুষ কৃপাপ্রার্থী নয়। তারা নিজেরাই সমস্যা সমাধান ও হানাদার উৎসাদনে কৃতসংকল্প।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আশফাক হোসেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ" অপ্রকাশিত এম.ফিল, অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ১৪৪, ৪৭।
২. *জাতিসংঘ সনদ* (ঢাকা ঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৮৪) পৃঃ ৪।
৩. *জয়বাংলা* (মুজিবনগর) ১১ মে, ১৯৭১। টাঙ্গাইলের বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা আঃ মান্নান ১৯৭১ সালে জয়বাংলা পত্রিকার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন।
৪. ঐ, ১৯ মে ১৯৭১।
৫. আশফাক হোসেন "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা ও ভারত" দ্র. সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত) *প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা ঃ উচ্চতর সমাজবিদ্যা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. *জয়বাংলা*, ৩০ শে জুলাই, ১৯৭১।
৭. আশফাক হোসেন, 'শরণার্থী সমস্যা ও ভারত' পৃঃ ১৮০-৮০।
৮. *জয়বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
৯. ঐ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
১০. ঐ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
১১. আশফাক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫।
১২. *জয়বাংলা* ৪ অক্টোবর, ১৯৭১।
১৩. *জয়বাংলা* ২১ অক্টোবর, ১৯৭১।
১৪. *মুক্তিযুদ্ধ* (মুজিবনগর), ১৮ জুলাই, ১৯৭১।
১৫. ঐ, আগস্ট ১৯৭১।
১৬. ঐ।
১৭. ঐ, ১০ অক্টোবর, ১৯৭১।
১৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২) পৃঃ ৩৮-৪৪।
১৯. আশফাক হোসেন, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, পৃঃ ১২০-১৩০।
২০. *Bangladesh* (Mujibnagar), 14 July, 1971.
২১. Ibid, 14 July, 1971.
২২. Ibid, 28 July, 1971.
২৩. Ibid, 17 November, 1971.
২৪. Ibid, 8 December, 1971.
২৫. *মুক্তিযুদ্ধ*, ২৫ জুলাই, ১৯৭১ এবং *জয়বাংলা*, ৩০ জুলাই, ১৯৭১।
২৬. আশফাক হোসেন, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৫, আরো দেখুন Asian Recorder (India)-6-12 August, 1971.
২৭. *International Herald Tribune* (Paris) 10 August, 1971.

২৮. মুজিব নগর সরকারের দলিলপত্র।

২৯. আশফাক হোসেন, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, পৃঃ ৯৫।

৩০. ঐ।

৩১. Henry Kissinger, *White House Years* (Delhi:Vikas Publishing House, 1979), P. 187.

৩২. *New York Times* (USA) 23 November, 1971.